ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিচয়

-মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

ফাসাদ অর্থ কোন ভাল জিনিসকে নষ্ট ও বিকৃত করা, শান্তি ধ্বংস করে অশান্তি আনয়ন করা। আল্লাহ তাআলা এই সুন্দর পৃথিবীকে মানুষের জন্য শান্তিময় করে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ যাতে দুনিয়াতে শান্তিতে জীবনযাপনের পাশাপাশি আখেরাতের জীবনের জন্যও শান্তির নিশ্চয়তা অর্জন করে যেতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্রও প্রদান করেছেন। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশীমত চলতে শুরু করে, স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালীপনার আশ্রয় নেয়, তখনই এই শান্তির পৃথিবীটা অশান্তির নরককুণ্ডে পরিণত হয়। অতএব, আল্লাহদ্রোহিতাই পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তি ও ফেতনা-ফাসাদের কারণ। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব, যুগে যুগে আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিরাই আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দাদের মাঝে ফেতনা-বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হয়েছে। পৃথিবীর সকল যুগে সকল স্থানে সকল জাতির মাঝে এরাই ফাসাদের জন্ম দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সমস্ত মানুষ তো একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে।" (সূরা ইউনুস) মানুষ আল্লাহর পৃথিবীতে সকলে মিলে এক আল্লাহর এবাদত করবে, এক আল্লাহর বান্দারূপে বসবাস করবে, এটাই শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। কিন্তু কেউ যখন মানুষকে এক আল্লাহর বন্দেগি থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের গোলামী করতে বাধ্য করে অথবা অন্য কিছুর পূজা-অর্চনার মাঝে ব্যাপৃত করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ ঐক্যসূত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং নানা দল-উপদলের উদ্ভব হয়ে দলাদলি, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, সংঘাত ও হানাহানির সূত্রপাত হয়। এছাড়া ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিরা মানুষের উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এবং মানুষের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টিতেও দ্বিধা করে না, যেমনটি করেছিল ফেরাউন নামের এক স্বৈরাচারী শাসক। তার এ কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, "ফেরাউন জমিনের উপর উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা কাসাসঃ৪) মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এ কাজটি মূলত দুইভাবে হয়ে থাকে-- প্রশাসনিক ও ভৌগলিক বিভক্তি এবং অনৈক্য ও শত্রুতাজনিত বিভক্তি। প্রথমটি হচ্ছে মানুষকে জোরপূর্বক পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতাপরায়ণ করে তোলা। মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টিও আবার দুইভাবে হতে পারে। একটি হচ্ছে সরাসরি এক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা। অন্যটি হচ্ছে একজনকে উপলক্ষ বানিয়ে আরেকজনের উপর নিষ্পেষণ চালানো, যাতে একে অপরকে নিজের জন্য ভোগান্তির কারণ ভাবতে বাধ্য হয়। একেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের প্রতি একেক ধরনের আচরণ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি হিংসা ও বিতৃষার মনোভাব জাগ্রত হয়। যার প্রতি বৈষম্য করা হয় তার মনে বঞ্চনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়, আর যার প্রতি আনুকূল্য দেখানো হয় তার মনে নিজের প্রতি অহংকার ও আভিজাত্যবোধ এবং বঞ্চিতজনের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব সৃষ্টি হয়। আর আনুকূল্যকারীর প্রতি জেগে ওঠে আনুগত্য ও গোলামীর ভাবধারা। ফেতনাবাজ স্বৈরশাসকদের চিরাচরিত রীতি divide and rule পলিসি অনুযায়ী ফেরাউন একটি শ্রেণীকে মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং অন্যান্য শ্রেণীকে নানারকম ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদেরকে সেই দুর্বল শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিজের পক্ষে লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে। বর্তমান বিশ্ব মোড়লরাও ফেরাউনী কায়দায় সমগ্র পৃথিবীকে বিভিন্ন দেশ-অঞ্চল ও জোট-ব্লকে বিভক্ত করে রেখেছে এবং তার মধ্যে তৃতীয় বিশ্বকে দুর্বল করে রেখেছে। আবার তৃতীয় বিশ্বকেও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছে আর তার মধ্যে মুসলমানদের সবচেয়ে দুর্বল করে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শাসন ও অন্যান্য আগ্রাসী তৎপরতায় প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশই আজ দরিদ্র ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। আবার মুসলমানদেরকেও নানারকম জাতীয়তাবাদের ফাঁদে ফেলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করে রেখেছে এবং তার মধ্যে একটি দেশকে পর্যায়ক্রমে আক্রমণ, অবরোধ ও নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে সবচেয়ে পঙ্গু ও দুর্বল করে দিয়ে পরিশেষে সেই নিরস্ত্র ও দুর্বল দেশটিকে চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশটির মাটি, পানি ও বাতাসকে এমনভাবে বিষাক্ত করে দিয়েছে যে, সেদেশের দুর্বল ও অসহায় মানুষগুলোর সামনে এখন তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। সাম্রাজ্যবাদীরা বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য কোন কোন দেশ বা সংগঠনকে মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী বলে নাজেহাল করছে এবং কোন কোন দেশকে মডারেট মুসলিম বলে কাছে টেনে নিয়ে নিজেদের পক্ষে আনুগত্য আদায়পূর্বক তাদের কাছ থেকে সেই কথিত সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর্থন ও সহযোগিতা আদায় করে নিচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় যখন যাকে ঘায়েল করার প্রয়োজন হবে তখন তাকে সন্ত্রাসী বানানো হবে, আর যখন যার সহযোগিতা প্রয়োজন তখন তাকে উদারপন্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে। আজ যাকে মডারেট মুসলিম বলে বরণ করে নিচ্ছে, কাল যে তাকে মৌলবাদী বলে কুপোকাত করে দেবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ইংরেজরা যখন মুসলিম দেশগুলো শাসন করতো, তখন প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের জনগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে আলেম-ওলামা ও তালেবে এলেমদের প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিসমূহ কেড়ে নিয়ে আর তাদের জন্য চাকরী-বাকরির দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে সবচেয়ে দুর্বল, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ করে রাখার ব্যবস্থা করে গেছে। ফেরাউন কেবল জনগণকে বিভক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে রাখার জন্য নিরীহ মানুষের জীবন ও ইজ্জতের উপর আঘাত হানার ন্যায় জঘন্যতম ফাসাদের আশ্রয় নিয়েছে। তার নির্দেশে বনী ইসরাইলের নবজাতক শিশুপুত্রদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হতো এবং মেয়েদেরকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে রেখে দেয়া হতো। নিজের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের পাশাপাশি জনগণকে অবৈধ নারী সম্ভোগে লিপ্ত রেখে নিজের স্বৈরাচারী শাসনের সমর্থক বানানোর জন্যই সে নারীদেরকে জীবিত রাখত। ছেলেদেরকে হত্যার মাধ্যমে মেয়েদেরকে অভিভাবকহীন করে তুলতে পারলে তাদেরকে ইচ্ছেমত ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে, এছাড়া জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় নারীরা আপনাআপনি বিপথগামী হয়ে পড়তে

বাধ্য হবে। এভাবে আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহর অপছন্দনীয় কার্যকলাপ চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের উপর থেকে আল্লাহর প্রভুত্ব ক্ষুণ্ন করে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ফেরাউনের মূল লক্ষ্য। মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য নারী ও শিশুদেরকে লাঞ্ছিত করা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের চিরাচরিত পদ্ধতি। যুদ্ধে-শান্তিতে সর্বক্ষেত্রেই তারা এ ধরনের কাপুরুষোচিত পন্থা অবলম্বন করে। বর্তমান আধুনিক যুগেও তাদের এ ফেরাউনী বর্বরতায় কোন ঘাটতি দেখা যায়নি, বরং আরো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অতীতের ফেরাউন যেমন বনী ইসরাইলের শিশুদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে হত্যা করত, তেমনি বর্তমানকালের ফেরাউনরা ইরাকের শিশুদের উপর নানারকম বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় অস্ত্র নিক্ষেপের মাধ্যমে নানারকম দুরারোগ্য রোগব্যাধিতে আক্রান্ত করেছে এবং খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহে বাধা দিয়ে সেই সমস্ত শিশুদেরকে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মৃত্যুর দুয়ারে নিক্ষেপ করছে। কিবতি ফেরাউন যেমন ছেলেদেরকে হত্যা করে মেয়েদেরকে কব্জা করে নিত, তেমনি বিলাতি ফেরাউনরা আজ বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে পুরুষদেরকে ঋণের ফাঁদে ফেলে আর্থিকভাবে নিঃস্ব করে কার্যত মৃত ও নিষ্ক্রিয় বানিয়ে দিয়েছে, আর নারীদেরকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিত রাখার ব্যবস্থা করে নিজেদের ভোগের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছে। ফেরাউনের ন্যায় ফ্যাসাদপ্রিয় লোকেরা মানুষকে ফ্যাসাদে ফেলার জন্য বেছে বেছে মানুষের স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতেই আঘাত হানে। যে দুটি জিনিস মানুষের জন্য সর্বাধিক সেনসিটিভ পয়েন্ট, যে দুটি জিনিসের উপর আঘাত আসলে মানুষ সবচাইতে বেশি ব্যথা পায়, যে দুটি জিনিস হারালে মানুষ যাবতীয় সাহস, মনোবল, উৎসাহ-উদ্দীপনা, সর্বোপরি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যে দুটি জিনিস মানুষের পারিবারিক শান্তির কেন্দ্রবিন্দু, সে দুটি জিনিস হচ্ছে শিশুদের জীবন ও নারীদের সম্ভ্রম। এজন্য শিশু ও নারীরাই হয় এসব দুরাচারীদের প্রধান টার্গেট। এ ধরনের খোদাদ্রোহী জালেম শাসকেরা নিজেদের সৈন্যদেরকে এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয় যাতে তারা প্রতিপক্ষের জনগণের দুর্বল পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আঘাত হানতে পারে। তারা সৈন্যদেরকে শিখায় যে, যুদ্ধে হার-জিতের ব্যাপারটাই আসল, এজন্য যা যা করা দরকার তা সবই করতে হবে-- তা মানবতার জন্য কল্যাণকর হল নাকি বিপর্যয়কর হল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। নিষ্ঠুরতা ও নির্লজ্জতায় যারা অধিক দক্ষতা দেখাতে পারবে, তাদেরকেই বেছে বেছে নিজেদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে। শিশুহত্যা ও নারীধর্ষণের ন্যায় অপকর্ম এরা কেবল নিজেরাই করে না, বরং সারা দুনিয়ার মানুষকে এসব কাজে অভ্যস্ত করে তুলতে চায়, পৃথিবীর জমিনকে ফাসাদে ভরে দিতে চায়। তারা যেসব দেশকে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারে, সেসব দেশের লোকদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার সময়ও সেই রণকৌশলই শিক্ষা দেয়, যা তারা নিজেদের আর্মিকে দিয়ে থাকে। এই ফেতনাবাজদের শিখিয়ে যাওয়া যুদ্ধনীতিকে যারাই আঁকড়ে থাকবে, তাদের দ্বারা কেবল ফাসাদ সৃষ্টির শয়তানী কার্যই সম্পন্ন হবে, কোন ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠা বা খোদায়ী উদ্দেশ্য পূরণের কাজ তাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। বস্তুতঃ ফেরাউনের মত যারাই মানুষকে আল্লাহর এবাদতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিয়ে দুনিয়ার মানুষের উপর নিজের সার্বভৌমত্ব চাপিয়ে দিয়েছে, তারা জনগণকে খুন-খারাবি ও বিভেদ-বিসম্বাদ ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারেনি।

যারা ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায়, তারাই আবার নিজেদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বলে প্রচার করে এবং যারা সত্যিকারভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের নামেই ফাসাদ সৃষ্টির অপবাদ দেয়। তাদের এ ধূর্ততা ও প্রতারণার চিত্র স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তুলে ধরেছেন আল-কুরআনের আয়াতে। এরশাদ হচ্ছে, "আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাই তো মীমাংসাকারী। মনে রেখো, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।" (সূরা বাকারাঃ১১,১২) তারা হয় নিজেদের ফাসাদকেই মীমাংসার পথ বলে দাবি করে, অথবা ফাসাদের কাজে নিজেদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে। যেসব ক্ষেত্রে তারা ফাসাদকে মীমাংসা বলে, সেসব ক্ষেত্রে যারা সত্যিকারভাবে সংশোধনের পথ অবলম্বন করে তাদের পথকেই ফাসাদের পথ বলে প্রচার করে। আর যেসব ক্ষেত্রে তারা ফাসাদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে, সেসব ক্ষেত্রে তারা নিজেদের কৃত ফাসাদের দায়দায়িত্ব অন্য কারো উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সেই ফাসাদের সমাধানকারীরূপে আবির্ভূত হয়। বর্তমানে ইহুদী-খ্রীস্টানরা কোথাও শান্তি স্থাপনের নামে গায়ে পড়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আবার কোথাও শান্তিপূর্ণ সমাধানের নামে অশান্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। একথা ঠিক যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে কাউকে কঠোর শাস্তি দিতে হয়, আবার কারো প্রতি নমনীয় ও সহানুভূতিশীল হতে হয়। কাউকে ধ্বংস করতে হয়, আবার কাউকে রক্ষা করতে হয়। কিন্তু স্বঘোষিত শান্তির ঠিকাদাররা নিরপেক্ষভাবে এ দায়িত্বটি পালন করার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ ও শত্রুতা চরিতার্থ করাকেই মূল লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে এবং তাদের এসব হীন উদ্দেশ্য ও জিঘাংসাবৃত্তি পূরণের হাতিয়ার হিসেবে শান্তি ও সমাধানের বুলিকে ব্যবহার করে। এ ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের কারণে তারা যাদেরকে শাস্তি দেয়া দরকার তাদেরকে সংশোধিত হবার সুযোগদানের নামে ফাসাদ চালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়; পক্ষান্তরে যারা শাস্তির যোগ্য নয়, তাদেরকে সংশোধনের নামে কারণে অকারণে চরম শাস্তি প্রদান করে। তারা কোথাও কোন ব্যক্তি বা জাতির কল্যাণ সাধনের নামে সেই ব্যক্তি বা জাতির উপরই চড়াও হয়েছে, আবার কোথাও এক ব্যক্তি বা জাতিকে রক্ষা করার নামে অপর কোন ব্যক্তি বা জাতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। কোথাও নৈতিক সংশোধনের নামে আবার কোথাও বা জাগতিক কল্যাণ সাধনের নামে মানুষের অনিষ্ট সাধনে মেতে উঠেছে। কোথাও তারা আত্মপ্রকাশ করেছে সংশোধনমূলক শাস্তিদানকারী হিসেবে, আবার কোথাও আবির্ভূত হয়েছে সেবকের বেশে। বিভিন্ন ছলছুতায় তারা শান্তিকামী মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করতে এগিয়ে এলেও যারা সত্যিকারভাবেই অশান্তির কারণ, যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া বাস্তবেই জরুরী, তাদের প্রতি এরা কেবল ক্ষমাসুন্দর আচরণই করে না, বরং সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে পুরস্কৃত করে এই যুক্তিতে যে, এতে তারা খুশী হয়ে ভাল হয়ে যাবে। যারা সম্পূর্ণ নিরীহ, নিরপরাধ ও দুর্বল, তাদেরকে সন্ত্রাসী ঘটনা কিংবা গণবিধ্বংসী অস্ত্র রাখার মিথ্যা অভিযোগে চরমভাবে শায়েস্তা করে এবং তাদের প্রতি যারা কোনরূপ সহানুভূতি পোষণ করবে তাদেরকেও শাস্তির হুমকি প্রদান করে। পক্ষান্তরে যারা প্রকৃতপক্ষেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটায় এবং প্রকাশ্যে ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের পাহাড় গড়ে তোলে, তাদেরকে কোনরূপ শাসন করার পরিবর্তে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের জন্যও পুরস্কারের ঘোষণা প্রদান করে। এরা অশান্তির জনককে শান্তির দূত বলে আখ্যায়িত করে; আর যারা অশান্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় তাদেরকেই শান্তির শত্রু হিসেবে সাব্যস্ত করে। মীমাংসার নামে ফাসাদ সৃষ্টির এই সমস্ত বিষয় ও দিকগুলোই আমরা এখানে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরব।

জালেমরা যখন কোন ব্যক্তি বা জাতির উপর জুলুম করে, তখন তাকেই সংশোধনের দাবি করে। এভাবে তারা নিজেদের মনের ভিতরের শয়তানী আক্রোশকে হিতাকাঙ্ক্ষার আবরণে ঢেকে রাখতে চায়। বিশেষ করে কাফের-মুনাফিকরা মুসলমানদের উপর নিজেদের নিষ্ঠুরতাকে সংশোধনমূলক আর মুসলিম ভাইদের সহানুভূতিকে অনিষ্টকারক বলে প্রচার চালায়। এই ফেতনাবাজরা মুখে সংশোধনের কথা বললেও আসলে তারা মানুষকে সংশোধন করতে চায় না, বরং কলুষিতই করতে চায়। মানুষের গুণগুলোকে দোষরূপে চিহ্নিত করে এবং সেই গুণগুলো দূর করে যাবতীয় দোষকে গুণ বলে চাপিয়ে দিতে চায়। আর বাস্তবে যদি কারো দোষত্রুটি থেকেও থাকে এবং সেই দোষ-ত্রুটি সংশোধনের নামেও যদি তারা অত্যাচার করে থাকে, তাহলেও বুঝতে হবে, সেই সমস্ত দোষত্রুটি সংশোধন করা তাদের ইচ্ছা নয়, বরং সেগুলোকে আরো বাড়িয়ে তোলাই উদ্দেশ্য। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তারা মানুষের যেসব দোষত্রুটি সংশোধন, ফেতনার মীমাংসা বা সমস্যা সমাধানের নামে অস্থিরতা প্রদর্শন করে; সেই সমস্ত দোষত্রুটি, ফেতনা বা সমস্যা মূলতঃ তাদেরই সৃষ্ট। যারা কুয়েত মুক্ত করার নামে ইরাকের উপর চড়াও হয়েছিল, আসলে তারাই ইরাক ও কুয়েতের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করে ইরাককে কুয়েত দখলে প্ররোচিত করেছিল। আমাদের এ ধারণা যদি সত্য নাও হয়ে থাকে, তবু একথা তো দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ্য ব্যাপার যে, পূর্বে ইরাক ও কুয়েত একই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইংরেজরাই তাদেরকে বিভক্ত করার মাধ্যমে অশান্তির বীজ রেখে যায়। এছাড়া যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মূল করা বা স্বৈরশাসকের স্বৈরশাসন উৎখাত করার নামে তারা নিরীহ নিরপরাধ মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, সেই গণবিধ্বংসী অস্ত্রও তারাই সরবরাহ করেছিল এবং স্বৈরশাসককেও তারাই জনগণের উপর স্বৈরশাসন ও নিপীড়ন চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রতিবেশী দেশ এবং নিজ দেশের জনগণের উপর গণবিধ্বংসী অস্ত্রের লাগামহীন ব্যবহারের দ্বারা গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর কার্যটি কাদের মদদে, কাদের ছত্রছায়া ও পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত হয়েছিল, তা দুনিয়ার মানুষ জানে। অথচ আজ তারা নিজেদের সরবরাহকৃত সেই গণবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংসের নামে নিজেরাই গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করেছে; তাও আবার কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ঘাঁটিতে নয়, বরং গণমানুষের বসতিতে। গণবিধ্বংসী অস্ত্রের নিশানা হয়েছে সেই দুধের শিশুরা, যারা কিনা গণবিধ্বংসী অস্ত্র তো দূরের কথা, একটা ঢিল-পাথরও স্পর্শ করেনি। ইরাকী মুসলমানদের উপর মানবেতিহাসের এই জঘন্যতম বর্বরতাটি চালানো হয়েছে ইরাকী জনগণকে মুক্ত করার নামে। ইরাকীদের উপর মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকা চাপিয়ে দেয়ার পাশাপাশি ঈমান ও চরিত্র ধ্বংস করার জন্য পাপাচারের যে অবাধ সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতা' প্রদান বলতে সম্ভবত সেটাই বোঝানো হয়েছে। বসনিয়ায় যারা শান্তিপূর্ণভাবে যুদ্ধ অবসানের নামে সার্বদেরকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখত, প্রকৃতপক্ষে তারাই সার্বদেরকে বসনিয়া আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিল। ইহুদীরা সার্বদের মাঝে মুসলিম-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছিল এবং খ্রীস্টানরা সেই বিদ্বেষ চরিতার্থ করার প্রেক্ষাপট তৈরী করে দিয়েছিল। জাতিসংঘের দ্বারা গণভোট আয়োজনের মাধ্যমে বসনীয় মুসলমানদের তাৎক্ষণিকভাবে একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়। এর মাধ্যমে মুসলমানদের ফেলা হয় উভয় সংকটে। কেননা স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিলে ক্ষিপ্ত সার্বরা হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে, অপরদিকে যুগোশ্লাভ ফেডারেশনে থাকার পক্ষে রায় দিলে সার্বদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া বসনিয়া ও কসোভোকে যুগোশ্লাভিয়ার হাতে তুলে দেয়ার কাজটিও পশ্চিমাদের দ্বারাই হয়েছিল। অথচ এরাই সার্বদেরকে সংশোধিত হয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে আসার সুযোগ দানের নামে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। এরা যুদ্ধের তীব্রতা রোধ করার নামে বসনিয়ার উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, অথচ সেই যুদ্ধের আগুন তারাই প্রজ্জলিত করেছে। পশ্চিমারা এক পর্যায়ে মুসলিম ও ক্রোটদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করলেও সেই ঐক্যের মাঝেই অনৈক্যের বীজ নিহিত রেখেছে। তারা মুসলিম-ক্রোট ফেডারেশনে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু করে আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করলেও এর দ্বারা সংখ্যালঘু ক্রোটদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করার সুযোগ করে দিয়েছে। ন্যাটো সৈন্যরা কসোভোর মুসলিম যোদ্ধাদের উপর চড়াও হয়েছে এই যুক্তিতে যে, মেসিডোনিয়ায় যাতে অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে। অথচ এরাই মেসিডোনিয়ার সার্বপন্থী সরকারকে আলবেনীয়দের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে অশান্তির সূচনা করিয়েছে। শুধু তাই নয়, আলবেনীয় গেরিলাদের মেসিডোনিয়ায় অনুপ্রবেশ রোধ করার নামে সীমান্ত এলাকায় সার্ব সৈন্য মোতায়েনেরও অনুমতি দিয়েছে। যেখানে সার্ব সৈন্য প্রত্যাহারের বিনিময়ে মুসলিম যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করা হয়েছিল, সেখানে মুসলমানদের অস্ত্র ফেরত না দিয়ে একতরফাভাবে সার্বীয়দের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ যে কত বড় জঘন্য প্রতারণা তা না বললেও চলে। যুগোশ্লাভ সৈন্যরা যে কেবল সীমান্ত এলাকায়ই বসে থাকবে না, বরং আলবেনীয় গেরিলাদের সাথে সংঘর্ষের সূত্র ধরে কসোভোর অভ্যন্তরেও প্রবেশ করবে এবং শান্তিরক্ষীরাও যে শন্তিপূর্ণভাবে নির্বিবাদে কসোভোকে পুনরায় সার্ব বাহিনীর হাতে তুলে দেবে তাই অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায়। ইতিপূর্বে কসোভোতে যে সার্বীয় তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়েছে, ফাসাদের নায়করা সেই ফাসাদের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছে। যারা ফিলিস্তিনীদের প্রতারণামূলকভাবে উৎখাতের মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের হাতে তুলে দিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করে মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির বীজ বপন করেছিল, তারাই আজ শান্তি প্রক্রিয়ার নামে ফিলিস্তিনীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে ইসরাইলের অবস্থানকে সুসংহত করে দিচ্ছে। যে ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে সকল অশান্তির মূল, সেই ইসরাইলের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাটাই যেন শান্তির পূর্বশর্ত হয়ে দাড়িয়েছে। যারা মাদক পাচার রোধের নামে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতো, তারাই আন্তর্জাতিকভাবে বয়কট আরোপের মাধ্যমে দেশটির কৃষকদের দারিদ্রসীমার নিচে নামিয়ে আফিম চাষ অব্যাহত রাখতে বাধ্য করেছিল। আসলে আফিম চাষের কারণে ইহুদী-খ্রীস্টানরা ক্ষুব্ধ হয়নি, বরং তৎকালীন তালেবান শাসক কর্তৃক মাদক উৎপাদন বন্ধের প্রচেষ্টাই ছিল তাদের ক্ষোভের কারণ। তালেবান উৎখাতের পর আফিম চাষ বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রাসী শক্তির সেই হীন উদ্দেশ্যকেই প্রমাণিত করে। পশ্চিমারা মাদক উৎপাদন বন্ধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বললেও তারা মূলত মাদকাসক্তি ও নারী নির্যাতনকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মুসলিম নারীরা শান্তিতে নিরাপদে নির্বিঘ্নে সম্ভ্রমের সাথে জীবনযাপন করবে, এটা ইসলামের শত্রুদের জন্য বড়ই অসহনীয় ব্যাপার। যারা সোমালিয়ার মানুষকে বাঁচানোর নামে হাজির হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তারাই বিবদমান দলগুলোকে উস্কানী দিয়ে ও অস্ত্র সরবরাহ করে সেদেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল। এভাবে দেশটি যখন সম্পূর্ণ ফতুর হয়ে গেল, তখন তারা সেখানে সৈন্য পাঠানোর বাহানা তালাশ করার জন্য প্রথমে কিছু ত্রাণ-সামগ্রী পাঠালো, তারপর সেগুলো লুট হওয়ার প্রেক্ষিতে সেই ত্রাণ-সামগ্রী পাহারা দেয়ার কথা বলে সৈন্যদের পাঠিয়ে দিল। সেখানে যাওয়ার পর তারা রিলিফ বিতরণের

নামে বিপুল সংখ্যক ক্ষুধার্ত মানুষের মাঝে সামান্য কিছু ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি ও ভিড়ের চাপে মৃত্যু ঘটিয়ে তামাশা দেখা ছাড়া আর কিছু উপহার দিতে পারেনি। এমনকি লুটতরাজ ঠেকানোর নামে নির্বিচারে গুলী চালিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুধার্ত মানুষকে হত্যা করতেও তাদের হাত কাঁপেনি। আজ যারা পূর্ব তিমুরে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছে, তারাই সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উস্কে দিয়ে সংকটের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। এছাড়া ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সৈন্যদের চরিত্র থেকে সংযম ও মানবিক মূল্যবোধ উচ্ছেদ করে তাদেরকে রিঅ্যাকটিভ বানিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়। অত্যাচারীরা নিজেদেরকে অন্যায়ের শাস্তিদানকারী ও সংস্কারক এবং নির্যাতনের প্রতিবাদকারীদেরকে অন্যায়ের প্রশ্রয়দানকারী ও পৃষ্ঠপোষক বলে প্রচার করে। পক্ষান্তরে যারা সত্যিকারভাবেই অন্যায়ের প্রতিকার করতে চায় তাদেরকে মানবাধিকার লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত করে, কেউ ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধের জন্য আক্রান্ত ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রমণকারী ভাইকে প্রতিহত করলে তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে।

ফেতনাবাজরা সবসময় যে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাই নয়, বরং অনেক সময় প্রকাশ্য শত্রুতার পরিবর্তে সাহায্য, সেবা, সহযোগিতা, প্রলোভন ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা মানুষকে বশীভূত করে কৌশলে ক্ষতির মাঝে নিক্ষেপ করে। এর দ্বারা জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ধরনের ক্ষতিই সাধন করা হতে পারে। তারা মানুষের সুখে-দুঃখে অংশীদার হয়ে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস চালায়। বর্তমানে ইসলামবিরোধী এনজিওগুলো সেবার নামেই তাদের মিশন চালাচ্ছে। তারা মানুষের দারিদ্র দূরীকরণের নামে কর্মকাণ্ড চালালেও তারা একদিকে যেমন সুদের জালে বন্দী করে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র আরো বৃদ্ধি করছে, তেমনি নগদ অর্থে মানুষের দ্বীন-ঈমান সব কিনে নিচ্ছে। তারা শিক্ষাদান ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আমাদের শিশুদের অপরিপক্কতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে সামান্য চকলেট খাইয়ে ঈমান বরবাদ করে দিচ্ছে। এভাবে মানুষকে শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম থেকে সরিয়ে দিয়ে অশান্তি ও অকল্যাণের ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে মূলত পৃথিবীতে বিপর্যয়ই সৃষ্টি করছে। কসোভোর মুসলমানদেরকেও সেবার নামে বশীভূত করার প্রয়াস চালিয়েছে ইহুদীবাদীরা। যে ইহুদীরা সার্বদেরকে মুসলিম নিধনে প্ররোচিত করেছিল, তারাই আবার কসোভোর উদ্বাস্তুদের জন্য বিনোদন সেন্টার খুলে মুসলমানদের আহাম্মকের স্বর্গে ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। বসনিয়ার মুসলমানদের শক্তিপ্রয়োগে কাবু করতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু অস্ত্র সাহায্য ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে বাগে আনার প্রয়াস চালায় পশ্চিমারা। তারা হয়ত প্রশিক্ষণের নামে ঈমান ও নৈতিকতাবিরোধী কলাকৌশলই শিক্ষা দেবে। এভাবে সহযোগিতার ছলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট করে ফাসাদের দিকে ধাবিত করাই ফেতনাবাজদের কাজ। বর্তমানে যারা বোমা ফেলে ইরাকী মুসলমানদের সর্বসান্ত করেছে, তারাই যুদ্ধের পরে 'যীশুর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে' ইরাকীদের সেবায় এগিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে 'যীশুর বাণী' শিক্ষা দিতে শুরু করেছে। যে আফগানিস্তান ছিল বিশ্বের একমাত্র ঋণমুক্ত দেশ, সেই আফগানিস্তানের মাটি, মানুষ ও সম্পদ সবকিছু তছনছ করে দিয়ে তারপর আবার সাহায্যের নামে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিতে এগিয়ে এসেছে নরপিশাচের দল। আমাদের বাংলাদেশকেও যারা দু'শ বছর শোষণ করে এবং কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে ফতুর করেছে, তারাই আবার কখনো সরকারীভাবে ঋণ সাহায্য দিয়ে আর কখনো বা এনজিও-মিশনারীদের সেবা দিয়ে মহানুভবতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করছে। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমা দাতারা সাহায্যের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলোকে নানারূপ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে গণঅসন্তোষ ও গণবিক্ষোভের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয় এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটায়, যার ফলে সরকারের পতন হয় আর দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। মতলববাজরা কখনো সেবামূলক কাজকেই মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, আবার কখনো অনিষ্টমূলক কাজকে ঢেকে রাখার জন্য সেবামূলক কাজকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে।

ফেতনাবাজরা সমাজ থেকে যাবতীয় কল্যাণকর জিনিসকে মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করে তা উচ্ছেদ করে দিয়ে মানব সমাজে অশান্তির কারণ ঘটায়। মানুষকে কল্যাণ থেকে দূরে রাখার জন্য সকল কল্যাণকর জিনিসের মাঝেই অকল্যাণ আবিষ্কার করে। কল্যাণের ধর্ম ইসলামকে প্রগতির অন্তরায় বলে প্রচার করে এবং এই ধর্মের বিধিবিধানগুলোর মাঝেও কোন না কোন অপকারিতা আবিষ্কার করে। অপরদিকে যাবতীয় অকল্যাণকর জিনিসকে কোন না কোন সমস্যার সমাধানরূপে দেখিয়ে সমাজে তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালায়। উদাহরণসরূপ, তারা পতিতালয় চালু রাখার মাঝে ধর্ষণ সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করে। অথচ পতিতালয়ই হচ্ছে ধর্ষণের সুতিকাগার এবং ব্যভিচারের প্রাকটিস ছাড়া কেউ ধর্ষণকারী হতে পারে না। যে জিনিস মানবতার জন্য অকল্যাণকর সে জিনিস পুরাতন হলেও তাকে এরা ঐতিহাসিক স্মৃতি, পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও সভ্যতার নিদর্শন বলে সংরক্ষণ করতে চায় এবং তা ধ্বংস করাকে মানবতার উপর আঘাত বলে আখ্যায়িত করে। পক্ষান্তরে মানুষের জন্য কল্যাণকর জিনিসকে পুরাতন হবার দোহাই দিয়ে সেকেলে, ব্যাক ডেটেড, জরাজীর্ণতা, পশ্চাদপদতা ও কুপমণ্ডুকতা বলে তার মূলোৎপাটন করতে চায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে শুরু করে পারিবারিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে মুনাফিকরা মানুষের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ থেকে বাঁচানোর নামে মানুষকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখে আর অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে। এ ধরনের মানুষেরা নিজেদের সন্তানদেরকেও শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে আল্লাহর এবাদতে বাধা প্রদান করে; অথচ তারাই জুলুম-নির্যাতনের দ্বারা শারীরিক অসুস্থতা সৃষ্টি করে, যাতে এবাদত-বন্দেগি করতে না পারে।

যারা একাধারে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং ছলনা, বাকচাতুর্য ও কথামালার দ্বারা মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, তাদের সম্পর্কে কুরআনের এক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে তাদের ফাসাদের রূপ, প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কেও একটা ধারণা দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনের ভাষায়, "আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে এরা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ক্ষমতা ও সুযোগ পায়, তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও মানব বংশ ধ্বংস করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারাঃ২০৪,২০৫) শয়তান চায় মানুষ তার সমস্ত শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইসলাম ও মানবতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করুক, শস্যক্ষেত্র দিয়ে শয়তানের পছন্দনীয় আগাছা ও নোংরা বৃক্ষ উৎপাদন করুক। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশে নিজ নিজ শস্যক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষা করতে সংকল্পবদ্ধ হয় এবং এর দ্বারা উত্তম শস্য ও পবিত্র

বৃক্ষ উৎপাদন করতে চায় তখনই শয়তান তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ে। শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। শস্যকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা কিংবা শস্যক্ষেত্রকেই চিরতরে অকেজো করে দেয়ার মত যত রকম উপায়-উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল রয়েছে, সেসব মানুষের মাঝে ফেরি করে বেড়ায়। মতলববাজরা জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের নামে বৈধ ও স্বাভাবিক পন্থায় সুস্থ-স্বাভাবিক ও পবিত্র সন্তানের জন্মদানকে নিরুৎসাহিত করলেও অবৈধ ও অস্বাভাবিক পন্থায় অসুস্থ, অস্বাভাবিক ও অপবিত্র সন্তানের জন্মদানকে তারা সর্বতোভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। পিতামাতার ঘরে দু'চারটি সন্তানের জন্ম তাদেরকে মানব জাতির ভবিষ্যত চিন্তায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করলেও অবাধ যৌনাচারের মাধ্যমে জারজ সন্তানে দুনিয়াটা ভরে দিতে কিংবা ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে তারা কোনরূপ বিব্রত বোধ করে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর দুশমনেরা নিজেদের শান্তিপ্রিয়তা, আপোষকামিতা, সহনশীলতা, কল্যাণকামিতা ও সত্যবাদিতার কথা যত জোর গলাতেই প্রচার করুক না কেন; আসলে তারাই চরম ফেতনাবাজ। যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদের নীল নকশা কাফের-মুনাফিকরাই করে থাকে, আর মুসলমানরা তাদের ফাঁদে পা দিয়ে অপরাধীরূপে চিহ্নিত হয়। আমেরিকা ও বৃটেন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং যখন তখন যেখানে সেখানে হস্তক্ষেপ করে। অথচ ইংরেজরাই সংশ্লিষ্ট দেশগুলো তাদের শাসনাধীনে থাকাকালে সেসব দেশে মানবিক অধিকারকে কবরস্থ করেছে। জনগণের উপর তাদের শোষণ-নিপীড়ন দেখে ভুক্তভোগীরা ভাবতে শিখেছে মানুষকে শাসন করার পদ্ধতিই বুঝি এরূপ। ফলে বৃটিশরা যখন উপনিবেশগুলোর শাসনক্ষমতা স্থানীয় নেতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, তখন সেই স্থানীয় নেতারাও দেশবাসীর উপর শাসন চালাতে গিয়ে ইংরেজ অনুসৃত নীতিই অবলম্বন করল। আর জনগণের স্বভাব-চরিত্রও ইংরেজ শাসনের ফলে এমনভাবে বদলে গেল যে, তাদেরকে আর আগের মত নরম পন্থায় শাসন করার উপায় রইল না, বরং নিষ্ঠুর পন্থাই প্রয়োগ করতে হলো। জালেম যে লাঠি দিয়ে মজলুমকে পিটায়, সেই লাঠিটাই মজলুমের হাতে দিয়ে নিজে কেটে পড়ে, যাতে মজলুম মানুষ মূল জালেমকে না পেয়ে মনের ক্ষোভ নিজের ভাইয়ের উপর মেটাতে গিয়ে নিজেই জালেমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সুযোগ বুঝে সেই জালেম আবার মীমাংসাকারী সেজে আসতে পারে। আজ আমরা যেসব ফেতনা-ফাসাদ ও অকল্যাণের সম্মুখীন হচ্ছি সেসবের বীজ ইংরেজরাই বপন করে রেখে গেছে, যাতে সেই বীজ থেকে চারাগাছ হয়ে তা যখন মহীরুহে পরিণত হবে তখন যাতে মানুষ বলতে বাধ্য হয় যে, এর চেয়ে বৃটিশ আমল ভাল ছিল। মোটকথা, ইহুদী-খ্রীস্টান ও মুনাফিকরা যেসব সমস্যার সমাধান করার কথা বলে, সেসব সমস্যা ইতিপূর্বে তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানেও সেসব সমস্যার সমাধান করতে চায় না, বরং মীমাংসার নামে জটিলতাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে চায়। সংকট সৃষ্টি করা, তাকে জিইয়ে রাখা, তার বিস্তার ঘটানো এবং তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়াই ফেতনাবাজদের কাজ। যে কাজ শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় সে কাজে অযথা জটিলতা সৃষ্টি করে। এরা পাগল ব্যক্তির হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার নামে ইরাকে গণহত্যা চালিয়েছে। অথচ এই সেয়ানা পাগলরাই গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করে চলেছে।

মুনাফিকদের ধৃষ্টতা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদকেই ফাসাদ বলে চিহ্নিত করছে এবং আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদেরকেই সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্যবস্তু বলে ফতোয়া দিচ্ছে। এই মুনাফিকরা দেশী-বিদেশী কুফরী শক্তির যোগসাজশে দেশবাসীকে ধর্ষণের সেঞ্চুরী উপহার দেবার পরও এরা শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী, আর মুজাহিদরা সেই অভিশপ্ত দশা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে চাওয়ায় তারা হয়ে গেল ফাসাদ সৃষ্টিকারী! পৃথিবীর যেসব দেশ ও অঞ্চলে মুসলমানরা ইসলামের জন্য নির্যাতিত হচ্ছে তার প্রত্যেকটি ইস্যুতে যারা প্রকাশ্যে বিধর্মী জালেমদের পক্ষে ও নির্যাতিত মুসলমানদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং স্বদেশে নাস্তিক-মুরতাদ বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে, তারাই কিনা ইসলামের সেবক, আর ইসলামপন্থীরাই নাকি ধর্মব্যবসায়ী। ইসলামকে সমূলে বিনাশ করার চিন্তায় যাদের ঘুম নেই, তারাই কিনা ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করার দাবিদার। যারা মানুষের রক্ত নিয়ে হোলিখেলায় অভ্যস্ত, মানুষের ইজ্জত ও সম্ভ্রম যাদের হাতে ভূলুণ্ঠিত, বিশ্বব্যাপী অশান্তি সৃষ্টি করাই যাদের মিশন, অশান্তিকেই যারা শান্তি মনে করে, তাদের কাছে এরা শান্তির নামে হরেক রকম সনদ-খেতাব আর পুরস্কার লাভ করলেও কোন সুস্থ বিবেক এদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বলে সায় দিতে পারে না।

সূরা বাকারার দ্বাদশ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। একথার দুটো অর্থ হতে পারে। এক হতে পারে, তাদের কার্যকলাপের দ্বারা যে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা তারা বুঝতেই পারে না। নিজেদের স্বার্থ ও জেদের বশে অন্ধ হয়ে এমন কাজ করে যা তাদের মনের অজান্তেই মানুষের জন্য অশান্তির কারণ ঘটায়। আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, তারা মানুষের অশান্তি ও অকল্যাণ সাধনের নিয়তেই কাজ করে, কিন্তু এ কাজটিকে তারা অন্যায় মনে করে না। তারা সবকিছু জেনেশুনেই করে, তবে ফাসাদ সৃষ্টির কাজকেই ভাল কাজ মনে করে। হাদীসে আছে, "মানুষ যখন কোন একটি গোনাহর কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ রাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।" কামাল পাশার মত মদ্যপ ও লম্পটেরা সুস্থতাকেই বিকারগ্রস্ততা মনে করে, আর বিকারগ্রস্ততাকে মনে করে সুস্থতা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "শয়তান তোমাদের খারাপ কাজসমূহকে তোমাদের সামনে সুশোভিত করে দেখায়।" শয়তান তাদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে, পাপকে আর পাপ মনে হয় না। অপবিত্র কর্মকে মনে হয় পবিত্র কর্তব্য। খুন-খারাবি করা, মানুষের সাথে ফাসাদ সৃষ্টি করা, ইসলামের বিরোধিতা করা আর আল্লাহর সাথে টেক্কা মেরে চলাকে তারা উচিত কর্ম বলেই মনে করে। এছাড়া তারা বুঝতে পারে না কথাটির আরো একটি তাৎপর্য সম্ভবত এই হতে পারে যে, তাদের শঠতা যে মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছে, তারাই যে জনগণের কাছে অশান্তির কারণরূপে চিহ্নিত হয়েছে, সেদিকে তাদের খেয়াল থাকে না।

আশাকরি, আমাদের আলোচনা থেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিচয় পাঠকের কাছে মোটামুটিভাবে পরিস্কার হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মুষ্টিমেয় সংখ্যক ফেতনাবাজের পক্ষে সারা দুনিয়াতে ফাসাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়, যদি না সাধারণ মানুষের ভূমিকা তাদের অনুকূলে হয়। আমরা যারা ফাসাদকামী নই, শান্তিপ্রিয় মানুষ, কিন্তু ফেতনাবাজদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের মনের অজান্তে ফাসাদের শিকার হই অথবা ফাসাদে জড়িয়ে পড়ি, ফেতনা-ফাসাদ বন্ধ করার দায়দায়িত্ব

মূলত আমাদের উপরেই বর্তায়। পৃথিবীতে সব ধরনের অশান্তির প্রধান কারণ হল, মানুষ যার হাতে মার খায় তার উপর প্রতিশোধ নেয় না, প্রতিশোধ নেয় অন্য জায়গায়। যে ঢিলটি উপরের দিক থেকে আসে, সে ঢিলটি নিচের দিকে পাস করার পরিবর্তে উপরের দিকে রিটার্ন করে দেয়াই ফাসাদ বন্ধের একমাত্র উপায়। মানবতার দুশমনেরা মানবজাতির মধ্যে ফেতনা-ফাসাদের যে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা করেছে তা ছিন্ন করার জন্য দুনিয়াবাসীকে সচেতন করে তুলতে হবে। ফেতনাবাজদের ফাসাদের যুপকাষ্ঠে মানুষ শুধু বলি হতে থাকবে, অথচ সেই নাটের গুরুদের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগবে না, এটা মেনে নেয়া যায় না। ফেতনাবাজদের ব্যাপারে মানুষের দুইটি পরস্পরবিরোধী ভূমিকাও ফাসাদ বিস্তারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। মানুষ অনেক সময় উদারতা দেখাতে গিয়ে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকেই প্রশ্রয় দেয়, শান্তির খাতিরে একে অপরকে অশান্তি সৃষ্টিকারী লোকদের আনুগত্য করার উপদেশ দেয়, এমনকি ফাসাদমূলক কার্যকলাপের প্রতি সমর্থনও প্রদান করে; আবার অনেক সময় ফেতনা-ফাসাদ দমন করতে গিয়ে নিরপরাধ মানুষের সাথেও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে বসে। অথচ যেকোন ধরনের বাড়াবাড়ি, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও হঠকারিতা কেবল ফাসাদকারীদের হাতকেই শক্তিশালী করবে, তাদেরই উদ্দেশ্য পূরণ করবে। ফাসাদমুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে আমাদেরকে বেছে বেছে ফাসাদকারীদের প্রতিই আঘাত হানতে হবে, আর সকল নিরপরাধ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে, তাদের সাথে ফাসাদকারীদের যত নিকট সম্পর্কই থাকুক না কেন। জাহেলী যুগে মানুষ অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে অপরাধীর গোত্রের লোকজনের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করত, যা ফাসাদ বন্ধের পরিবর্তে নিত্য নতুন ফাসাদের জন্ম দিত। ইসলামই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছে যে, অপরাধীকেই শাস্তি দিতে হবে এবং পিতার অপরাধে পুত্রকে শাস্তি দেয়া যাবে না। এভাবে অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা ইসলামই প্রণয়ন করেছে এবং এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইসলামেরই প্রাপ্য। অতএব, ইসলামই ফেতনা-ফাসাদ দূর করার একমাত্র পথ। আমাদের আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধ মানেই ফাসাদ নয়। নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা ফাসাদ, আর ফাসাদকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করাই ফাসাদ। ফাসাদকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে যদি ফাসাদ ভেবে এড়িয়ে চলি, তাহলে আমাদেরকে ফাসাদকারীদের হাতে যেমন একতরফাভাবে ফাসাদের শিকার হতে হবে, তেমনি তাদের কূটকৌশলের ফাঁদে পা দিয়ে আমাদের নিজেদের পরস্পরের বিরুদ্ধেই ফাসাদে জড়িয়ে পড়তে হবে। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ফাসাদ ও অকল্যাণ থেকে দুনিয়াবাসীকে মুক্ত করে শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করার এক মহান দায়িত্ব দিয়েই আল্লাহ মুসলিম জাতিকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যাবতীয় ফাসাদের পথ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদেরকে চিহ্নিত করা, দুনিয়ার মানুষকে তাদের থেকে সতর্ক করা এবং শক্তি প্রয়োগে ফেতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন করা। বলাবাহুল্য, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিচয় জানাই যথেষ্ট নয়, বরং ফাসাদের বিরুদ্ধে বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই প্রয়োজনের দাবি। আর এই ফাসাদ নির্মূলের জন্য আল্লাহ তাআলা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন প্রতিকার ব্যবস্থা প্রদান করেননি। অতএব, আল্লাহর দুনিয়া থেকে আল্লাহর শত্রু ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের উৎখাত করার জন্য আজই আমাদের সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, ফাসাদের মূল নায়কদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া কঠিন। কারণ, রাঘব বোয়ালরা কেউ ফ্রন্টলাইনে আসে না, চুনোপুটিদেরকেই ময়দানে মাঠিয়ে নিজেরা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অতএব, শুধু সম্মুখ যুদ্ধের উপর নির্ভর করলে অপরাধীদের তুলনায় নিরপরাধ মানুষের রক্তপাতই বেশি ঘটবে। তাই মূল ফাসাদকারীদেরকেই আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানাতে হবে এবং পৃথিবীর যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাদেরকে পাকড়াও করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "আর যদি তারা ওয়াদা করার পর শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।" (তওবাঃ১২)

সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ১৮--২৪ এপ্রিল, ২০০১